প
রি
ক্রি
মা

আলোর দূতী

এই বছরটি ভগিনী নিবেদিতার সার্ধ শতবৎসর পূর্তির পুণ্য অবসর। নিবেদিতার আকস্মিক প্রয়াণ সেকালে তাঁর সুহৃদ্‌বন্ধু ও অন্তরঙ্গদের কাছে এক দিব্য আলোক-উৎসের নির্বাণ। স্বামীজীর এই কন্যাটির পরিচয় শুধু তাঁর বিদ্যাবুদ্ধির বিশালতাই ছিল না। একটি মহৎ অন্তঃকরণ কীভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজেকে তিলে তিলে গলিত লাভার তীব্রতায় দহনে দহনে ভস্মীভূত করেছিল একটি আপন করে নেওয়া ভিন্ন দেশ ও জাতির জন্য—তার অনুপুঙ্খ ইতিহাস কে-ই বা জানত? আজও কজন ভারতবাসী সেই মহত্তমার মূল্যায়ন করতে পেরেছেন আমরা জানি না।

তবে ''নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।'' কবির এই শাশ্বত মূল্যায়ন আজ যেন ভগিনীর জীবনকে অবলম্বন করে রূপ নিতে চলেছে।

তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের সঙ্গে তাঁর তুলনা আমরা করতে পারি না, কারণ তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-চিহ্নিত যুগাচার্য, বিশ্বাচার্য। সেই পুরুষসিংহ লৌকিক ও ঐহিক মানুষদের সঙ্গে থেকেও যেন অপরিমিত উচ্চলোকে, মহৎ চিন্তা ও বহুজনের কল্যাণকারী চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত হোমাপাখির শাবক এক লহমায় পরিণামশীল জগতকে ডানার ঝাপটায় অতিক্রম করে সুস্থিত হয়েছিলেন অনন্ত অসীমে। তাঁর অবতরণ অখণ্ডের ঘর থেকে সেই প্রেমিক ঋষির সস্নেহ আহ্বানে, যিনি মূর্তিমান প্রেমের বিগ্রহ (Love Personified)। বিদ্রোহী প্রমিথিউস দেবতাদের কাছ থেকে আগুন হরণ করে মর্ত্য মানবের কাছে সে-আগুন বিতরণ করেছিলেন—মানুষেরই কল্যাণের জন্য। অখণ্ডের ঋষি জ্ঞান-কর্মের সঙ্গে আনলেন দৈবী প্রেম। তারই পাঠ নতুন করে নিলেন শ্রীগুরুর কাছে। শিবজ্ঞানে জীবসেবা সহজ কথা নয়। বিবেকানন্দ জীবদুঃখ বহন করে চোখের জলে রাতের অন্ধকারে গাইছেন—'দরদ না জানে কোই...।' সে যে বড় কঠিন কৃত্য! তার মূলে আছে আত্মোৎসর্গ। লন্ডনে বক্তৃতাকালে তিনি সেই অপূর্ব গুণটি দেখতে পেলেন মার্গারেট এলিজাবেথ নোবলের মধ্যে। নিজেকে উৎসর্গের প্রেরণায় এক মহৎপ্রাণ ব্যাকুল। সত্যকে জানার আশ্চর্য আগ্রহ তাঁর! গতানুগতিকতার জাল ছিঁড়ে ভাবনার উদার অঙ্গনে আসতে চায় এক অশান্ত প্রাণ। স্বামীজী চিনতে ভুল করেননি। নিবেদিতা কি ছিলেন শাস্ত্রকথিত মুমুক্ষু? বদ্ধজীবন থেকে মুক্ত হওয়ার তীব্র আগ্রহে কি তিনি ভারতে এসেছিলেন? না, তাঁর গুরু ঠিকই বুঝে নিয়েছিলেন ওই তেজস্বিনী সিংহিনীকে। তিনি বলেছিলেন, ''নিবেদিতা দিতে এসেছে...।'' সে-দেওয়া মানে আদর্শের পাদপীঠে নিঃশেষে নিজেকে উৎসর্গ করা।

ভারতের আধ্যাত্মিক ভাব নিবেদিতা গ্রহণ করেছিলেন সেকথা সত্য কিন্তু স্বামীজী বুঝেছিলেন তাঁর কন্যাটি শুধু নিতে নয়, দিতে এসেছেন। কী দিতে? আমাদের হারানো ধন ফিরিয়ে দিতে, যে-ধন সম্বন্ধে আজও আমরা উদাসীন, বিদেশের সম্পদের ভাণ্ডারের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। আজকের সমাজে পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোত তরতর করে বইছে, ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের ছেলেমেয়েদের। সেকালের কবি লিখেছিলেন, ''মোদের গরব মোদের আশা/ আ

মরি বাংলাভাষা।" আজ চিত্রটি সম্পূর্ণ উলটে যাচ্ছে। স্বাধীনতার আগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা বিলিতি দ্রব্য বর্জন করার সাহস দেখিয়েছিলেন অত্যাচারিত হয়েও। অথচ আজ সচেতনভাবে আমরা বিদেশের দ্রব্য শুধু নয়, তাদের সমাজের কাঠামোকেও গ্রহণ করে ঘর ভাঙছি, স্বার্থপর ও ভোগবাদী হয়ে পড়ছি। এ হল ইতিহাসের পরিহাস।

নিবেদিতা জ্বলন্ত দেশাত্মবোধ নিয়ে এদেশে পা রেখেছিলেন। স্বামীজী তাঁকে করেছিলেন ভারতকন্যা। বিশ্বাচার্যের কাছে তাঁর শিক্ষা হয়েছিল। স্বামীজী তাঁর মনস্বিনী কন্যাটির চিন্তা-ভাবনা, সমাজ-সংস্কৃতির ধারণা—সবকিছু চূর্ণ করে ভারতবর্ষকে চিনিয়েছিলেন। নিবেদিতার অণু-পরমাণুতে সংক্রামিত করেছিলেন নবীন ভারত ও প্রাচীন ভারতের নির্যাস।

স্বামীজী ছিলেন সাক্ষাৎ ভারতবর্ষ। সেই জীবন্ত জ্বলন্ত ভারতের সান্নিধ্যে থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল নিবেদিতার। নিবেদিতার চোখে ছিল নতুন আলো—সে-আলোর উৎস ছিলেন স্বামীজী যিনি নিজেই 'জ্যোতিঘন'। ত্যাগ-বৈরাগ্যের আগুনে তেজস্বী নরেনকে ঘিরে থাকত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেম। পদে পদেই ভগিনী তার পরিচয় পেতেন। কখনও ঝলসে যেতেন, কখনও দগ্ধ হতেন, তীব্র যাতনায় ছটফট করতেন চিন্তার সংঘর্ষে পূর্ব ধারণার ধ্বংসস্তূপ দেখে। তাঁর সত্তাকে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে আচার্য নির্মম। দেখছেন জন্ম নিচ্ছে এক নতুন সত্তা, গুরুর চরণে আত্মনিবেদনে যা সার্থক হতে চলেছে। নিবেদিতার পাশে থাকতেন মিস ম্যাকলাউড—যিনি তাঁর যন্ত্রণার আঁচ পেতেন। শেষে আলমোড়ার দিব্য পরিবেশে যন্ত্রণার অবসান ঘটালেন আচার্য। তাঁর দিব্য স্পর্শে শান্তি নামল অশান্ত চিত্তে। নিবেদিতা ওই ঘটনার উল্লেখ করে ডায়েরিতে লিখেছেন : শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন এমন দিন আসবে যখন নরেনের স্পর্শমাত্রে লোকের চৈতন্য হবে। এ যে কী প্রাপ্তি তা ধীরে ধীরে ভগিনী বুঝলেন। তিনি ভারতের সবকিছুর সঙ্গে মিশে গিয়ে হলেন 'ভারতভগিনী'। ভারতের তৎকালীন নবজাগরণের শীর্ষে যাঁরা তাঁরাই চিনলেন নিবেদিতাকে। তিনিই তাঁদের সামনে ভারতকে তুলে ধরলেন। তাঁর শ্রদ্ধা, ভালবাসা, ইতিহাসচেতনা সংস্কৃতির আকর ভারতকে তুলে ধরত শিক্ষিত শুধু নয়—উচ্চশিক্ষিত মানুষ, শিল্পী, কবি, ইতিহাসবিদ সকলের কাছে।

আজও ভারত আমাদের অপরিচিত, তার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিল্পবোধ—সবকিছুই আমাদের অগভীর চোখে পাঠ নেওয়া। যথার্থ মূল্যায়নের অভাবে সেসব লুপ্ত হতে চলেছে। জাতীয়তাবোধ জাগানোর জন্য ভগিনীর বিরাট ভূমিকা এখনও স্বল্প আলোয় আবছা হয়ে আছে। তবে সেই ইতিহাস বা ইতিবৃত্ত অস্বীকার করা অসম্ভব। বহু মানুষের স্মৃতিকথায় আজও তার কিছুটা ধরা আছে।

ভগিনীর কথা বলে শেষ করা যায় না। ইচ্ছা হয় সেই তেজস্বিনী আত্মবিলোপী সত্তার কাছে প্রার্থনা করি—তোমার জ্বালানো দীপাবলিতে আমরাও যেন জ্বলে উঠি স্বামীজীর চেতনায়, ভারতের কল্যাণে।

বড় বিলম্বে। কিন্তু ধীরে ধীরে বোধহয় আমরা ভগিনীর চারপাশে আসছি। হয়তো ভগিনীর মূল্যায়ন মানে তাঁর মতন আত্মোৎসর্গের দীপ জ্বালানো। হোক দেরি তবু আমরা অপেক্ষা করব—কবে আমাদের চেতনা দেশাত্মবোধে জাগ্রত হবে—ভারতের কল্যাণচিন্তা নিয়ন্ত্রণ করবে আমাদের ঘরে ঘরে লালিত ক্ষুদ্র জীবনগুলি।